

## সুন্দরবনের জল ও জঙ্গলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: নব্য-নির্ধারণবাদী বিশ্লেষণ

মিঠুন কুমার সাহা\*

**Abstract:** In the Liberation War of Bangladesh, its geographical features were influential in many ways on the activities of the freedom fighters and their opposing forces. This is even more true in the case of the liberation war of the Sundarbans in water and jungle. In June 1971, Under Lt. Ziauddin's leadership, freedom fighter bases were established inside the Sundarbans. The group is organised in the deep forest, accepting and in some cases overcoming the various obstacles of nature. Using the natural obstacles to their advantage, they again engaged the Pakistani troops and their allied forces in the immediate area. Using their positional advantage, these freedom fighters played an effective role in sending refugees and trainees across the border. On the other hand, the freedom fighters in Sundarbans were used as a transit for many of the freedom fighters who came from July with training and weapons to the interior of the country, especially in the Khulna-Barisal region. This article analyses such activities of the Sundarbans freedom fighters in a neo-deterministic trend.

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি বহুমাত্রিক বিষয়। এর মধ্যে অন্যতম একটি প্রসঙ্গ হলো রণাঙ্গন। প্রতিরোধ পর্ব বাদে রণাঙ্গনে যেসকল মুক্তিযোদ্ধা বিজয় অবধি তৎপর ছিলেন, তাদের একাংশ বাংলাদেশ সরকারের অধীন ভারত থেকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন আগস্ট মাসে। আর অপর অংশ স্থানীয়ভাবে সংগঠিত হয়ে যুদ্ধকালীন নয় মাসে অবরুদ্ধ দেশেই অবস্থান করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদেরকে মোকাবেলা করেছে। এমন একটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী হলো জিয়া বাহিনী। জল ও জঙ্গলময় সুন্দরবনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা এই মুক্তিযোদ্ধা দলকে হানাদার বাহিনীর পাশাপাশি বিরূপ প্রকৃতি ও পরিবেশকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। আবার অন্যদিকে, এই প্রাকৃতিক অবস্থার সুযোগ নিয়েই আলোচ্য মুক্তিযোদ্ধা দল শত্রুপক্ষকে নাস্তানাবুদ করতে সচেষ্ট ছিল। এক্ষেত্রে জিয়া বাহিনী তথা সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের এ সাফল্যের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ছিল সুন্দরবনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

এই প্রবন্ধটি রচনার মূল উদ্দেশ্য ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের একটি নির্দিষ্ট অংশে মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং সে স্বরূপ নির্মাণে ভূগোল ও মানুষের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ। এটি করতে তৎকালীন খুলনা জেলাধীন বাগেরহাট মহকুমাভুক্ত মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলা থানা এলাকা ও নিকটস্থ স্থানসমূহে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ (যা সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত) এবং সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মতৎপরতা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। শ্বাপদ-সঙ্কুল, গভীর অরণ্যময়, প্রায় স্থূলপথ রহিত জলময় এ এলাকার ভূগোল তথা প্রাকৃতিক ভূগোল সেখানকার মুক্তিযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য নির্মাণে কতটা প্রভাববিস্তারী ছিল এবং একইসাথে সেখানে প্রাকৃতিক ভূগোলের নির্ধারণবাদী আচরণের বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধারা কী

\* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কী কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলেন, তা নির্ণয় করার প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধে রয়েছে।

প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে প্রধানত ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যকার সম্পর্কের নব্য-নির্ধারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সুন্দরবনে মুক্তিযোদ্ধা দল জিয়া বাহিনীর সংগঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপট, এই বাহিনীর সাংগঠনিক বিন্যাস ও কয়েকটি নির্বাচিত যুদ্ধতৎপরতা উপস্থাপন করা হয়েছে। পদ্ধতিগত দিক থেকে প্রবন্ধটি পর্যালোচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী।

এই প্রবন্ধটি প্রধানত প্রাথমিক উৎসের উপর নির্ভর করে রচিত। আত্মকথা, স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার, সরকারি দলিলপত্র, মানচিত্র, প্রামাণিক গ্রন্থাবলি ইত্যাদি প্রাথমিক উৎসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আত্মকথা ও স্মৃতিকথার মধ্যে মেজর জিয়াউদ্দিন লিখিত মুক্তিযুদ্ধের সেই উন্মাতাল দিনগুলি (১৯৯৩), মেজর এম এ জলিল রচিত সীমাহীন সময় (১৯৭৪), দলিলপত্রের মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধ: দলিলপত্র, দশম খণ্ড (২০০৩), ও'ম্যালো, এল.এস.এস. রচিত *Bengal District Gazetteers: Khulna* (1908) এবং এ. রশিদ-এর *District Census Report Khulna, Parts, I-V, 1961*, (1961) বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে, স্বীকার্য যে, বর্তমান প্রবন্ধের নিরিখে এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্রায়শ 'অসম্পূর্ণ' এবং এই তথ্যভাব অপূর্ণীয় থাকায় প্রবন্ধটিতে মাধ্যমিক উৎসসমূহের মধ্যে স্বরোচিত সরকারি রচিত একাঙরে বাগেরহাট (২০০৬), হুমায়ূন রহমান লিখিত পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (২০১৮) ও শেখ গাউস মিয়া এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : সুন্দরবন সাব-সেক্টর (২০১১) গ্রন্থত্রয় হতে অকৃপণ সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

#### জল ও জঙ্গলের মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল চিহ্নিতকরণ

জল ও জঙ্গলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বলতে যে সুন্দরবন এলাকার মুক্তিযুদ্ধকে বোঝানো হচ্ছে- তা সূচনাপূর্বে টীকায় অংশত বলা হয়েছে। আলোচনার এই পর্বে জঙ্গলময় বৃহৎ সুন্দরবনের যে অংশে এবং সন্নিহিত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই এলাকা এবং তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু, জলভাগ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে এখানে সম্যক ধারণা দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

জেমস রেনেলের *এ বেঙ্গল এ্যাটলাস*-এর হিসাব মতে, সুন্দরবনের মোট আয়তন ৬১৮৩ বর্গমাইল (ব্রিটিশ)। (Major James Rennel, 2016:5) এই মানচিত্রে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি নদী থেকে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত জঙ্গলময় স্থানকে সুন্দরবন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ আবদুল জলীল এর মতে, “ভাগীরথী ও পদ্মা-মেঘনার মধ্যবর্তী ভূভাগের দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে অবস্থিত জঙ্গলাকৃত ভূভাগকে সুন্দরবন নামে আখ্যাত করা হয়েছে। এই সুন্দরবন ২৪ পরগনা, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ জেলার মধ্যে পড়িয়াছে”। (এ. এফ. এম আবদুল জলীল, ১৯৬৮:৭) উল্লিখিত জেলাগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ আমলে খুলনা জেলার আয়তন ছিল ৪৬৫২ বর্গমাইল যার মধ্যে ২৩১৬ বর্গমাইল এলাকা সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চল। (A. Rashid, 1961:I-4) এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে জলভাগ প্রায় ৫০০ বর্গমাইল। (এ. এফ. এম আবদুল জলীল, ১৯৬৮:১) তৎকালীন খুলনার স্থানীয় সরকারের হিসাব মতে, পশ্চিমবঙ্গের রায়মঙ্গল নদীর পূর্বতীর হতে পূর্বদিকে হরিণঘাটা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত বনাঞ্চল খুলনা জেলাধীন সুন্দরবন হিসেবে পরিগণিত। (A. Rashid, 1961:I-3,4) অপর একটি উৎসে অবশ্য খুলনার সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ ২০৮১ বর্গমাইল বলে দাবি করেছে। (O'Malley, L.S.S, 1908:82) এই উৎসেই খুলনা জেলাভুক্ত সুন্দরবনের তিনটি সার্কেল তথা সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট সার্কেলের মধ্যে বাগেরহাট সার্কেলের সুনির্দিষ্ট সীমানার উল্লেখ আছে। সুন্দরবনের খুলনা সার্কেলের পূর্ব সীমানা পশুর নদ থেকে আরো পূর্বে বালেশ্বর-হরিণঘাটা নদী পর্যন্ত অংশটি সরকারিভাবে সুন্দরবনের বাগেরহাট সার্কেল হিসেবে

স্বীকৃত। (O'Malley, L.S.S, 1908:85) আলোচ্য প্রবন্ধে সুন্দরবনের সীমানা হিসেবে এই বাগেরহাট সার্কেলভুক্ত অংশটিকে বোঝানো হয়েছে।

সুন্দরবনের বাগেরহাট সার্কেলভুক্ত যে অংশে লে. জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দল অবস্থান করত, সেটি প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। এর একটি অংশ লোকালয়- শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জ থানা এলাকা। আর অপর অংশ হলো ঐ লোকালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত গহীন বনভূমি যা বিস্তৃত একদম সমুদ্র পর্যন্ত। ব্রিটিশ আমলে খুলনা এলাকাভুক্ত সুন্দরবনে বসতি শুরু হয় ১৭৮৫ সালে, সরকার কর্তৃক অত্র বনাঞ্চলে আবাদের জন্য জমি ইজারা দেওয়া শুরু হলে। (O'Malley, L.S.S, 1908:41) সেই ধারাবাহিকতায় খুলনার বাগেরহাট সার্কেলভুক্ত এলাকায় জমি ইজারা দেওয়া শুরু হয় এবং সর্বপ্রথম ১৮৪৯ সালে মেসার্স আর. এন্ড টি. এইচ. মোরেল সুন্দরবনের একটা বড় অংশের জমির ইজারা ক্রয় করেন। (O'Malley, L.S.S, 1908:47) এ কারণে কালক্রমে এই অঞ্চলের নাম মোরেলগঞ্জ (থানা: ১৮৬৬ সাল) হয়। এরপর থেকে মোরেলগঞ্জের আরো দক্ষিণে স্থায়ী বসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে আর সুন্দরবন উত্তরে আরো হ্রাস পেতে থাকে। সরকারের আদমশুমারি রিপোর্টে দেখা যায়, সুন্দরবনলগ্ন মোরেলগঞ্জের জনসংখ্যা ১৯৫১ সালে ১,৫১,৪৪৩ জন আর ১৯৬১ সালে ১,৭৬,৭৬২ জন। একইসাথে সুন্দরবনের আরো ঘনিষ্ঠ শরণখোলায় (থানা: ১৯০৭ সাল) ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা ৩৮,৮৯০ জন এবং ১৯৬১ সালে ৫২,২১১ জন। (A. Rashid, 1961:IV-40) এছাড়া, সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে সরকারের বনবিভাগের কর্মীবৃন্দ ও তাদের সহযোগী বা নির্ভরশীল লোকজন বসবাস করে থাকেন। ১৯৫১ সালে বাগেরহাট মহকুমার অধীন সুন্দরবনের সংরক্ষিত অংশে বাসরত মানুষ ছিল ২০২৬ জন। (A. Rashid, 1961:IV-40)

সুন্দরবন অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণত আর্দ্র ও অস্বাভাবিক। বিশেষ করে বর্ষাকালে বাতাসের আর্দ্রতা খুব বেশি। জুলাই এখানে সর্বাপেক্ষা আর্দ্র মাস। গরম কালেও এখানে বাতাসের আর্দ্রতা ৮০° ডিগ্রি। সুন্দরবন ও সন্নিহিত অঞ্চলে ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রতি মাসে গড় বৃষ্টিপাত ছিল ৪.২৪" এবং সারা বছরে মোট বৃষ্টিপাত ছিল ৫০.৬১" এবং শেষ দশ বছরে এ স্থানে বৃষ্টিপাত হয়েছিল গড়ে ৫৪.৮৭"। (A. Rashid, 1961:I-6 ও Motaharul Haque, 1957:81)

সুন্দরবন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বনভূমি। এই গরান বনভূমির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বনস্থ বহুসংখ্যক নদী ও খাল যা শিরা-উপশিরার মতো এই বনকে জড়িয়ে রেখেছে। সুন্দরবনের সমস্ত নদীর উৎপত্তি আদতে গঙ্গা বা পদ্মা হতে হয়েছে। (এ. এফ. এম আবদুল জলীল, ১৯৬৮:১২) খুলনা জেলায় এইসব নদী উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। (A. Rashid, 1961:I-5) পদ্মা থেকে উৎপন্ন কপোতাক্ষ, গড়াই, ভৈরব, মধুমতি নদীগুলোই হলো সুন্দরবনের নদীগুলোর মূল আশ্রয়। ঐ নদীগুলোই শিবসা, পশুর, আড়পাঙ্গাশিয়া, শেলা ও বলেশ্বর নামে প্রকাণ্ড আকার নিয়ে সুন্দরবনকে সিক্ত করেছে। একই সাথে এ জেলার উত্তরে স্থিত পশ্চিম-পূর্বমুখি মিষ্টি জলের বিলগুলোর জলও উক্ত নদীসমূহ বয়ে নিয়ে সমুদ্রগামী হয়। ফলে, উক্ত নদীগুলোর পার ঘেঁষে গড়ে ওঠা জনপদ ও সুন্দরবনের অভ্যন্তরে বাসরত জনগোষ্ঠী উল্লিখিত উৎসমূহ হতে সারা বছর মিষ্টি জলের সরবরাহ পায়। এই কারণে সমুদ্র তীরবর্তী হলেও এসব স্থানের মানুষ সমুদ্রের নোনা জলের দ্বারা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (Motaharul Haque, 1957:81) ১৯৭১ সালে সুন্দরবনে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা মিষ্টি জলের জন্য উল্লিখিত উৎসসমূহ ব্যবহার করতেন। পাশাপাশি নোনা জলময় গভীর জঙ্গলে, যা সমুদ্রলগ্ন, এমন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা মিষ্টি জলের জন্য কুয়ো খনন করে তাদের চাহিদা মেটাতে। (মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর জব্বার, ২০২৩)

সুন্দরবনের বাগেরহাট সার্কেল ও সন্নিহিত এলাকার ইতোমধ্যে উল্লিখিত প্রধান নদীগুলো আবার নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ মুখে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। ভৈরব, মংলা,

পানগুচি, ভোলা, শেলা, মদত, চিত্রা, তেঁতুলবুনিয়া, দড়াটানা, নীলকমল, মালঞ্চ, মরা পশুর, পাখুরিয়া, পুটিমারী, ফয়লা, বলেশ্বর, সোনাধোয়া, হরিণটানা, ইলশামারী, পাজরখালী, গোমতি, ভৈরব, পাঠাকাটার ভরানী, বাংরা, বিষখালী, বিষ্ণু, বেতমোর, আঠারোবাঁকি, দুধমুখী, হরিণঘাটা ইত্যাদি নদী বনের মধ্যে বহমান। (মেজর (অব:) জিয়াউদ্দিন ও আসাদুজ্জামান, ২০০১:৩০ ও স্বরোচিষ সরকার, ২০০৬:১৮) এই নদীগুলোকে আবার জালের মতো জড়িয়ে রেখেছে অগণিত খাল। খালগুলোর মধ্যে শাপলা খাল, মোজাহের খাল, চান্দেশ্বর খাল, কচিখালী খাল, শুকপাতা খাল, ছিটে কটকা, ডোবার খাল, টাকার খাল, সিকির খাল, জামতলার সুন্দর খাল, কালিন্দিয়া খাল, সুন্দরীর খাল অন্যতম। (ড. মোঃ আবু হানিফ শেখ, ২০১৬:৩৫৩) এছাড়া, শরণখোলা রেঞ্জের নিকটবর্তী ছোট খালগুলোর মধ্যে যে খালগুলো মুক্তিযোদ্ধারা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলো হলো আড়াইবাঁকি খাল, মাইঠার খাল, মূর্তির খাল, কলমতেজি খাল, কাটাভারানির খাল, তামুলবুনিয়া খাল, তেঁতুলবাড়িয়া খাল, গোলবুনিয়ার খাল, তেড়াবাঁকা খাল, তেলিগাঁতি খাল, দৈবজ্জহাটি খাল, ধানসাগর খাল, সুপতির খাল, বগীর খাল, জয়বাংলার ভারানী।<sup>৩</sup>

১৯৭১ সালে সুন্দরবনের নিকটবর্তী যেসব স্থানে (শরণখোলা, মোরেলগঞ্জসহ) মুক্তিযোদ্ধারা বিচরণ করতেন, সেসময় ওখানে কোনো পাকা সড়ক ছিল না। তখন যোগাযোগের একমাত্র অবলম্বন ছিল নৌকা। তবে বাগেরহাট থেকে ছলারহাট পর্যন্ত একটি অনিয়মিত যাত্রীবাহী স্টিমার সার্ভিস চালু ছিল। বাগেরহাট-ছলারহাট পথে সার্ভিসটি শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জ হয়ে যেতো। (Motaharur Haque, 1957:82) মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাদল অত্র স্থানে গানবোটে করে টহল দিত। এসব এলাকা মূলত নবগঠিত পলল ভূমি হওয়ায় স্থলভাগের প্রায় পুরোটা ছিল নরম ও কাদামাটি। সেকারণে পাকিস্তানি সৈন্যদল কখনোই এখানে স্থলপথে টহল দেয়নি। নৌকা ব্যবহার করে টহল দেওয়ার দায়িত্বটি পালন করত তাদের সহযোগী রাজাকার, আল বদর বাহিনী। অপরদিকে, জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দল উল্লিখিত এলাকায় প্রায় পাঁচশত ছোট-বড় নৌকা ব্যবহার করে যাতায়াত করত। (মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর জব্বার, ২০২৩) এসব নৌকাগুলোর অধিকাংশ ছিল ডিঙি নৌকা। এছাড়া, এই দলের নিকট মাছ ধরা ছিপ নৌকা, বাওয়ালী নৌকা, মৌয়ালী নৌকাসহ অনেকগুলো বড় নৌকা ছিল।

### তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

মানুষের কর্মকাণ্ড শূন্যে সম্পাদিত হয় না। নিশ্চয়ই তা সম্পাদিত হয় একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসর ও পরিবেশে। মানুষের কর্মকাণ্ড ও ভূগোল মধ্য সম্পর্ক আছে। এইচ. বি. জর্জ তার *The Relations of Geography and History* (Oxford), 1901, 5<sup>th</sup> edn 1924 গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছেন, History is not intelligible without geography. ভূগোল ইতিহাসকে কতখানি প্রভাবিত করে, তা এই বাক্যে পরিষ্কার। জর্জকে একজন এনভায়রনমেন্টাল ডিটারমিনিস্ট বা ‘প্রাকৃতিক নির্ধারণবাদী’ বা ‘প্রাকৃতিক নিয়তিবাদী’ হিসেবে আখ্যায়িত করে আরেক ভূগোলবিদ এ্যালান আর. এইচ. বেকার মন্তব্য করেছেন, “... geography is not intelligible without History.” (Alan R. H. Baker, 2003:ix, 17) সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইতিহাস ও ভূগোল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আরো অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, ভূগোল ইতিহাসের ভিত্তি।

ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক নির্ধারণবাদী এ জাতীয় চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়ায় বিশ শতকের প্রথম ভাগে ফরাসি ইতিহাসবিদ লুসিয়েন ফেভার নতুন প্রস্তাব আনেন। তাঁর মূল কথা- প্রকৃতি নির্ধারণবাদী, সরোচ্চ, বস্তুনিষ্ঠ শক্তি (‘objective force’) নয়, না এটি অপরিহার্য বিষয়। বরং মানুষ নির্দিষ্ট অবস্থায় কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তার চাহিদা মতো প্রকৃতিকে বদলে নিতে সক্ষম।<sup>৪</sup> এই ধারার চিন্তাকে ‘পজিবিলিম’ বা সম্ভাবনাবাদ বা সম্ভাবনা তত্ত্ব বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ধারণা জগতে

নতুন প্রশ্ন আসে। তাহলে মানুষ কি প্রকৃতিকে তার প্রয়োজনমাত্রিক পুরোপুরি বদল করে নিতে সর্বাবস্থায় সক্ষম? কে সার্বভৌম- প্রকৃতি না মানুষ? বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় খ্রিফিথ টেইলর এবং ও.এইচ.কে. স্পেইট'র নিকট থেকে।<sup>৭</sup> টেইলরের ভাবনাটি 'স্টপ এন্ড গো ডিটারমিনিজম' বা 'থাম ও এগিয়ে যাও নির্ধারণবাদ' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। কাছাকাছি সময়ে ইংরেজ ভূগোলবিদ স্পেইট 'সম্ভাব্যতা তত্ত্ব' বা 'প্রবাবিলিজম' তত্ত্ব নিয়ে হাজির হন।<sup>৮</sup> এ ধারার চিন্তাবিদেরা মানুষের কর্মকাণ্ডে প্রকৃতি বা ভূগোলের প্রভাবকে অস্বীকার করেন না। আবার মানুষ প্রকৃতির ওপর সার্বভৌম, এ কথাও মানতে নারাজ। এইরূপ বিশ্বাসকে নব্য-নির্ধারণবাদ নামে চিহ্নিত করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালে লে. জিয়াউদ্দিনের<sup>৯</sup> নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দল নিঃসন্দেহে পারিপার্শ্বিক ভূগোল ও পরিবেশ দ্বারা বহুভাবে চালিত ছিলেন। আবার এও দেখা যায় যে, প্রয়োজনের নিরিখে তারা ভৌগোলিক বহু বাধা অতিক্রম করে কর্মতৎপরতা চালিয়েছেন। সে কারণে বর্তমান প্রবন্ধে তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে নব্য-নির্ধারণবাদ তত্ত্বকে ('থাম ও এগিয়ে যাও নির্ধারণবাদ' ও 'সম্ভাব্যতা তত্ত্ব') ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

### সুন্দরবনে মুক্তিযোদ্ধা দল গঠনের প্রেক্ষাপট

সুন্দরবন ও সন্নিকটস্থ এলাকায় লে. জিয়াউদ্দিন আহমেদের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধকালে একটি আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে উঠেছিল। পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজের স্নাতক পর্যায়ে ছাত্র থাকাকালে ১৯৬৯ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০-এ ক্যাডেট কোর্স সম্পন্ন করে তিনি লেফটেন্যান্ট পদে পাজ্জাব রেজিমেন্টের গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগ দেন। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:৪২)

১৯৭০ সালের নির্বাচন পরবর্তী ক্ষমতা হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে ইয়াহিয়া সরকারের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সমগ্র পূর্ব বাংলায় বিদ্রোহাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয় ১৯৭১-এর মার্চে। এ পরিস্থিতিতে পিরোজপুরের জনগণও বিক্ষুব্ধ ছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ও অন্যান্য শহরে সংঘটিত গণহত্যা এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার খবর পিরোজপুর পৌঁছায় একই রাতে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খান এমএনএ ঐ রাতেই মাইক যোগে স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রচার করেন ও পরেরদিন বিকালে অনুষ্ঠিতব্য জনসভায় উপস্থিত থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। (ছমাযুন্ন রহমান, ২০১৮:৬৫-৬৬) লে. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ইতোমধ্যে ২০ মার্চ পিরোজপুরে পৌঁছান। ২৬ মার্চ সকালেই ব্যক্তিগতভাবে তিনি এনায়েত হোসেন খান এমএনএ-র সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদিন দুপুর পর্যন্ত লে. জিয়াউদ্দিনের সাথে স্থানীয় ছাত্র ইউনিয়ন এর দুটি দলের আলাদা আলাদা বৈঠক হয়। এই বৈঠকে পিরোজপুরের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও যুদ্ধ কৌশল সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:৫২) পিরোজপুর মহকুমা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় ২৭ মার্চ। (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, ২০০৬:৪১) সংগ্রাম কমিটির প্রধানের ভূমিকায় ছিলেন অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খান এমএনএ। কমিটির পক্ষ থেকে পিরোজপুর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় লে. জিয়াউদ্দিনকে। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:৩৮) সংগ্রাম কমিটির তত্ত্বাবধান ও সহায়তায় পিরোজপুর শহরে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা শুরু হয়। লে. জিয়াউদ্দিনের তৎপরতায় শহরের রায়েরকাঠি জমিদার বাড়ির জঙ্গলে, কালিকাঠি ও শঙ্করপাশা গ্রামে গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:৬১) এছাড়া, পিরোজপুরের পার্শ্ববর্তী মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, স্বরূপকাঠি, বানারীপাড়া, কাউখালী, বাগেরহাটের কচুয়া, শরণখোলা, মোরেলগঞ্জ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রাখা হতে থাকে।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। ১৮ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাদল বরিশালে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য এপ্রিলের শুরু থেকেই পিরোজপুর সংগ্রাম কমিটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ পিরোজপুর ছেড়ে



যেতে শুরু করে। এই অবস্থায় মহকুমার পুলিশ কর্মকর্তারা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ইতিপূর্বে প্রদত্ত সমরাস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এর ওপর আবার মুক্তিযোদ্ধারা শহরে অবস্থান করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। অবশেষে মের ৪ তারিখে পিরোজপুর শহর পাকিস্তান সেনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হলে মুক্তিযোদ্ধারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, ২০০৬:৪২) জিয়াউদ্দিন আহমেদ এরপর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবন এলাকায় চলে যান।

### সুন্দরবনের জল ও জঙ্গলে মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন

পিরোজপুর শহর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে লে. জিয়াউদ্দিন ভারতে যেতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:৭৮) এরপর তিনি মোরেলগঞ্জে আসেন। মোরেলগঞ্জে স ম কবির আহমদ মধু প্রতিষ্ঠিত খাউলিয়া ক্যাম্পে মহীউদ্দিন কামাল ও আব্দুল আউয়ালকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ২২ মে উপস্থিত হন। (হুমায়ূন রহমান, ২০১৮:৯২) এরপর শরণখোলার সামসুল আলম তালুকদারের মুক্তিযোদ্ধা দলকে সংবাদ পাঠানো হয়। উভয়পক্ষ জিয়াউদ্দিন আহমেদকে নতুন মুক্তিযোদ্ধা দলের দলনেতা হিসেবে গ্রহণ করেন। আর এই মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান হন শামসুল আলম তালুকদার। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:৭৪) সুন্দরবনকে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করেন লে. জিয়াউদ্দিন। এই প্রস্তাব তিনি ইতোপূর্বে পিরোজপুর মহকুমা সংগ্রাম কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খানের নিকট উপস্থাপন করেছিলেন। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:৬০) তাই পিরোজপুরে যখন মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করা হয়, তখন জিয়াউদ্দিন সুন্দরবনের কোথায় কোথায় ক্যাম্প করা যায় তা গোপনে পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছিলেন। ২১ এপ্রিল শরণখোলা থানা আক্রমণের পর তিনি আরেক দফা সুন্দরবন 'রেকি' করে যান। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:৬৪ ও হুমায়ূন রহমান, ২০১৮:৯২)

সুন্দরবনে মুক্তিযোদ্ধা দলের ঘাঁটি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে লে. জিয়াউদ্দিন সদল এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:৭৪) বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে লে. জিয়ার দল কিছুদিন নৌকায় অবস্থান করে। এরপর জঙ্গল কেটে এখানে বসবাসযোগ্য ঘাঁটি তৈরি করে। ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা হয় শরণখোলা লাগোয়া সুন্দরবন থেকে প্রায় সাত কি.মি. ভেতরে আড়াইবাঁকিতে। জায়গাটা তিনটি খাল তথা আড়াইবাঁকি, মাইঠা ও মূর্তির খালের সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:৭৪-৭৫) এই ঘাঁটি মুক্তিবাহিনীর 'আড়াইবাঁকি ক্যাম্প' হিসেবে পরিচিত ছিল। কৌশলগত কারণে সুন্দরবনের এই অংশে ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়। আড়াইবাঁকি এলাকাটি জনবসতি থেকে খুব একটা দূরবর্তী ছিল না। অথচ শত্রুপক্ষের জন্য দুর্ভেদ্য ছিল। কেননা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং এর সহযোগী শক্তি সাধারণত গানবোট অথবা বড় নৌযান নিয়ে চলাচল করত। সুরু খাল বেয়ে উক্ত নৌযানে চেপে তারা আড়াইবাঁকি এলাকায় সহজে প্রবেশ করতে পারত না। অন্যদিকে, এই এলাকা থেকে বেরিয়ে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ চালাতে মুক্তিযোদ্ধারা তুলনামূলক সহজে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে পারতেন। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১৪৩)

আড়াইবাঁকি এলাকায় ঘাঁটি স্থাপনের পর মুক্তিবাহিনীর বগী ঘাঁটিকে করা হয় এর অগ্রবর্তী ঘাঁটি। বগী ঘাঁটির ভূকৌশলগত গুরুত্ব ছিল। বাগেরহাট ও পিরোজপুর এই দুটি এলাকার সীমানা দিয়ে প্রবাহিত প্রমত্তা বলেশ্বর নদীর পশ্চিম তীরে সুন্দরবনঘনিষ্ঠ বগীর অবস্থান। মুক্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী বগী ঘাঁটি ছাড়াও শরণখোলার ফরেস্ট অফিসকে জিয়া বাহিনীর 'কমান্ড পোস্ট' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:৭৫-৭৬) এরূপ নানা কৌশলগত স্থাপনা তৈরি করার মাধ্যমে কিছুদিনের মধ্যে আড়াইবাঁকি এলাকায় লে. জিয়াউদ্দিনের দল প্রায় ছোটো আকারের ক্যান্টনমেন্ট বানাতে সক্ষম হন। (লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী, ১৯৯১:২৭৮) স্মর্তব্য, সুন্দরবনঘনিষ্ঠ শরণখোলা থানার ধানসাগর

গ্রামে আগেই মুক্তিযোদ্ধাদের আরো একটি ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পটি ভোলা নদীর পশ্চিম পাড়ে শরণখোলা ও চানপায় রেঞ্জ অফিসের মাঝামাঝি ধানসাগর বন দপ্তরের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। (হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ২০০৩:৬২৩)

সুন্দরবনে লে. জিয়ার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী আড়াইবাঁকি ঘাঁটিকে কেন্দ্রে রেখে তেঁতুলবাড়িয়া ও তাম্বুলবুনিয়া খালের দুই তীরব্যাপী আনুমানিক পঞ্চাশটি ঘাঁটি গড়ে তোলে। তেঁতুলবাড়িয়া ও তাম্বুলবুনিয়া খাল এবং তৎপার্শ্ববর্তী প্রতিটি খাল ও এদের শাখা-প্রশাখা মিলে অন্যান্য চার কি.মি. বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এসব ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। এই ঘাঁটিগুলোর মধ্যে চারটি ছিল সর্ববৃহৎ ঘাঁটি। এদের একটি ছিল মুক্তিবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। তেঁতুলবাড়িয়ার দুধমুখী খালের পাড়ে ছিল এই ঘাঁটির অবস্থান। প্রধান দপ্তর, চিকিৎসাকেন্দ্র, অস্ত্রাগার, খাদ্য ও পণ্যগারসহ কয়েকটি স্থাপনা এই ঘাঁটিতে গড়ে তোলা হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাঁটি ছিল স্টুডেন্টস্ ক্যাম্প। তেঁতুলবাড়িয়ার পূর্ব দিকে অবস্থিত তাম্বুলবুনিয়া খালের উত্তর পাড়ে স্টুডেন্টস্ ক্যাম্পের অবস্থান ছিল। এই ক্যাম্পের অধিনায়ক ছিলেন ছাত্রনেতা লিয়াকত আলী খান ও তার সহকারী ছিলেন পরিতোষ কুমার পাল। মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় বৃহত্তম ঘাঁটি ছিল আড়াইবাঁকি ঘাঁটি। কবির আহমদ মধু ছিলেন এই ঘাঁটির অধিনায়ক এবং খালিদ হোসেন ছিলেন তার সহকারী। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:১০৭-০৮) লোকালয়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর চতুর্থ বৃহত্তম ঘাঁটি ছিল মোরেলগঞ্জ থানার জিউধরা ইউনিয়নের কালীবাড়ি গ্রামে। এর দায়িত্বে ছিলেন দু'জন কোম্পানি অধিনায়ক। বঙ্গবন্ধু কোম্পানির নূর মোহাম্মদ হাওলাদার ছিলেন তাদের একজন। ব্রাহো কোম্পানির হাবিবুর রহমান ছিলেন অন্যজন। (হুমায়ূন রহমান, ২০১৮:৯৯) মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি ও ক্যাম্পগুলো তেঁতুলবাড়িয়া খালের দুই তীর ধরে প্রায় বিশ মাইলব্যাপী অবস্থিত ছিল। একটার সঙ্গে আরেকটা ক্যাম্পের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনে জঙ্গল পরিষ্কার করে এখানে কাঁচা রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১৪৩) এই রাস্তার ধার দিয়ে বাংকার খনন করা হয়েছিল। এ পথে খাল পার হওয়ার জন্য বাঁশ দিয়ে অনেকগুলো সাঁকো তৈরি করা হয়েছিল। শত্রুসৈন্যের চোখ এড়িয়ে স্বল্প সময়ে ও নিরাপদে শরণখোলা বন দপ্তর থেকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান ঘাঁটিতে পৌঁছানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় এক কি.মি. দীর্ঘ খাল খনন করেছিলেন। এই খালের নাম রাখা হয় 'জয় বাংলার খাল' বা 'জয় বাংলার ভারানি'।

একাত্তরের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত জিয়া বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ছিল প্রায় দুই হাজার। অক্টোবর মাসের শেষার্ধ্বে এই মুক্তিবাহিনীতে প্রায় দশ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার সমাবেশ ঘটে। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:১০৫) ডিসেম্বর মাসে এ সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজারে উপনীত হয়। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:৯৪) এদের মধ্যে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন প্রায় তিন হাজার। ৯ সংখ্যক সেক্টর হেড কোয়ার্টারের নির্দেশে আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তারা জিয়ার বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৪ আগস্ট এই বাহিনীর নীতি নির্ধারণী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিনায়ক তার বাহিনী পুনর্গঠন করেন। পুনর্গঠিত কাঠামোয় লে. জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাহিনীর অধিনায়ক ও শামসুল আলম তালুকদার বাহিনীর উপপ্রধানের দায়িত্ব চালিয়ে যান। বাহিনীর সদস্য আবুল কালাম মহিউদ্দীনকে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা, শেখ আবদুল আসাদকে অপারেশনাল কর্মকর্তা, শহীদুল আলম বাদলকে অস্ত্রাগার তত্ত্বাবধায়ক, মোস্তফা হেলালকে খাদ্য কর্মকর্তা, নূরুল ইসলাম হাওলাদারকে অর্ধদপ্তর প্রধান, লিয়াকত আলী খানকে নিয়োগ কর্মকর্তা, আলতাফ হোসেন ও শহীদ আলীকে প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রধান এবং আব্দুল হাই খোকনকে অধিনায়কের সহকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩: ১০২-০৩, ১১১-১৪ ও হুমায়ূন রহমান, ২০১৮:১০০-০৩) আগস্টের শেষভাগে আগরতলা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত কর্পোরাল আব্দুস সামাদ এ বাহিনীতে যুক্ত হন। তিনি অধিনায়কের সহকারী অফিসার (কমান্ড) হিসেবে দায়িত্ব পান। (হুমায়ূন রহমান, ২০১৮:৮৫) উল্লিখিত দপ্তর/দায়িত্ব ব্যতীত এ বাহিনীতে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বিভাগ, ভারতের সাথে যোগাযোগ বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ ও

শরণার্থী বিভাগ ছিল। শরণার্থী ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এই বাহিনীতে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি কর্মরত ছিল। (হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ২০০৩:৬২৯-৩০) মুক্তিবাহিনীর মূল ঘাঁটিতে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল। চিকিৎসাকেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন ভান্ডারিয়ার ডাক্তার জাহাঙ্গীর আলম। এই কেন্দ্রে হোমিও ও পল্লীচিকিৎসক ছিলেন মঠবাড়িয়ার আবুল হোসেন, তাফালবাড়িয়ার আব্দুল কাদের, পিরোজপুরের ডাক্তার নুরুল হক ও মোরেলগঞ্জের ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুস। জিয়া বাহিনীর অধিনায়কের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। এছাড়া, মুক্তিবাহিনীতে একটি 'রেকি দল' ছিল যাদের ক্যাম্প ছিল তাম্বুলবুনিয়া খালের পূর্বে পাঙ্গাশিয়া খালের পাশে।

লে. জিয়ার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী তাদের কর্মপরিধির আওতাভুক্ত এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদল ও তাদের স্থানীয় সহায়ক শক্তিকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য এলাকাভিত্তিক সামরিক দায়িত্ব বণ্টন করেন। এর অংশ হিসেবে সুবেদার আব্দুল আজিজ ফুল মিয়াকে শরণখোলা থানার অধিনায়ক, আলী আহমদ খানকে মোরেলগঞ্জ থানার অধিনায়ক, নায়ক সুবেদার কবীর আহমদ মধুকে বাগেরহাটের কচুয়া, রামপালসহ নিকটবর্তী এলাকার অধিনায়ক, আফজাল হুসাইনকে সুন্দরবনের সাতক্ষীরাভুক্ত অংশের অধিনায়ক করা হয়। উল্লিখিত এলাকার বাইরে সুন্দরবন সাবসেক্টরের অবশিষ্ট এলাকা বাহিনী প্রধান লে. জিয়াউদ্দিন আহমেদের দায়িত্বভুক্ত ছিল। (হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ২০০৩:৬২৪)

সুন্দরবনে লে. জিয়ার মুক্তিবাহিনীর সদস্যদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার প্রয়োজনে জিয়াউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি বিচার বিভাগ চালু ছিল। সামরিক বিধিবিধান অনুসরণ করে এই বিচার বিভাগ পরিচালনা করা হতো। এ বিভাগের অধীন ছিল একটি জেলখানা। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:১০৯) মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ককে দাপ্তরিক কাজে মোহাম্মদ হেলাল সহযোগিতা করতেন। শামসুদ্দিন আজাদ, পরিতোষ কুমার পাল, বিপুল হালদার, মৃগাল কান্তি হালদার, ডাক্তার জাহাঙ্গীর প্রমুখ বিভিন্ন সময় অধিনায়কের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১২৭, ১৪৩)

### প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ

পিরোজপুরে ২৬ মার্চ মহকুমা শহরের বৈরাগীর ভিটায় প্রথম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। লে. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। এদিন বিকালে মহকুমা ট্রেজারি লুট হলে পনেরটি রাইফেল ও কিছুসংখ্যক গুলি লে. জিয়ার হস্তগত হয়। উল্লিখিত অস্ত্র দিয়েই ঐদিনই মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:৫৬-৫৭) এরপর সুন্দরবনে জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটি তৈরি হলে বাহিনীর সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। তেঁতুলবাড়িয়া খালের পূর্ব দিকে ও তাম্বুলবুনিয়া খালের উত্তর পাড়ে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবস্থান ছিল। জঙ্গল পরিষ্কার করে এই ক্যাম্পের সাথে একটি প্যারেড গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়। ক্যাম্পে বসবাসকারী সদস্যদের জন্য সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে একটি পুকুর কাটা হয়। সুন্দরবনে সুপতির নিকট হয়লাতলায় আরো একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এ কেন্দ্রটি আফজাল হুসাইনের নেতৃত্বে গড়ে তোলা হয়। শরণখোলা রেঞ্জ অফিস থেকে দক্ষিণে ক্ষুদিরামের খাল বরাবর ভোলা নদীর পূর্ব তীরে ছোটো একটি খালের পাড়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অবস্থিত ছিল। আলী আহমদ খানকে এই কেন্দ্রের প্রশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। (হুমায়ূন রহমান, ২০১৮:৯৯) খুরশীদ জাহান বেগমের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:১০৮-০৯) বাস্তব প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে দুই/তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে দুই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। একটি দলকে নিয়মিত



বাহিনীর মতো প্রথাগত সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। আর একটি দলকে কমান্ডার শহীদ আলীর তত্ত্বাবধানে গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল শেখানো হতো।

সুন্দরবনে লে. জিয়ার মুক্তিবাহিনীর প্রাথমিক অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে ওঠে ৩২টি রাইফেলের ওপর ভিত্তি করে। এ রাইফেলগুলো ২১ এপ্রিল শরণখোলা থানা আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধারা হস্তগত করেন। পিরোজপুর মহকুমার প্রতিটি থানা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জিয়া বাহিনীর পক্ষ হতে জুন মাসে যোগাযোগ করা শুরু হয়। ফলে বাহিনীতে প্রায় এক হাজার মুক্তিযোদ্ধা যোগ দেন। এদের মধ্যে অনেকের কাছেই আগে থেকে ৩০৩ রাইফেল ছিল। এছাড়া, সুন্দরবন মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অস্ত্র সহায়তা চাইলে দু'দফায় জিয়া বাহিনী বেশ কিছু কার্যকর অস্ত্র ও গোলাবারুদ পায়। এই মুক্তিবাহিনী ৯ নং সেক্টর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকেও অস্ত্র সহায়তা পেয়েছিল। ৩টি রিকয়েললেস রাইফেল, ৩টি ৩ ইঞ্চি মর্টার, অটোমেটিক রাইফেল, আনার্গা গ্রেনেড, লিম্পেট মাইন ও অন্যান্য হালকা অস্ত্র সহায়তা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা লাভ করে। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:৯৯, ১৫২ ও হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ২০০৩:৫৮১) তবে বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিকট থেকে দখল করে পাওয়া অস্ত্রই মূলত জিয়া বাহিনীর অস্ত্রসামর্থ্যের প্রধান উৎস ছিল।



উৎস: এ কে এম নাসিমুজ্জামান (সম্পা.)  
মানচিত্রে পৃথিবী ও বাংলাদেশ গ্রন্থ (পৃ. ৭)  
অবলম্বনে বর্তমান মানচিত্রটি লেখক কর্তৃক  
প্রস্তুতকৃত

### যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ\*

পাকিস্তান নৌবাহিনীর কমান্ডার গুলজারিনের নেতৃত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৯ম পদাতিক ডিভিশনের নেতৃত্বাধীন এডহক ব্রিগেডকে একান্তরে এপ্রিলের শেষভাগে বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় মোতায়েন করা হয়। (এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, ২০১২:৩৪৫) ব্রিগেড কমান্ড বরিশালে কর্নেল আতিক, পটুয়াখালীতে মেজর নাদের পারভেজ, পিরোজপুরে ক্যাপ্টেন এজাজকে নিযুক্ত করে। এদের অধিনায়কত্বে কয়েকটি কোম্পানি উল্লিখিত এলাকায় অবস্থান নেয়। উপরন্তু, খুলনা থেকে ২২ সীমান্ত রেজিমেন্টের একদল সেনা এ এলাকায় নিয়মিত টহলরত থাকে। (মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন ও আসাদুজ্জামান, ২০০১:৮) ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স (ইপিসিএএফ) এর ৫নং উইং এর একটি অংশ অত্র এলাকায় পাকিস্তান সেনাদলের উল্লিখিত শক্তির সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। (LT G. JFR Jacob, 2004:189) এছাড়া পাকিস্তানি নৌসেনা সুন্দরবন সংলগ্ন জলপথে গানবোটে করে নিয়মিত টহল দিত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তি আরো সংহত ও বৃদ্ধি করেছিল উল্লিখিত এলাকায় অবস্থিত থানাসমূহের পুলিশ সদস্য ও প্রায় আট হাজার সশস্ত্র রাজাকার।

পাকিস্তান সেনাদলের উল্লিখিত সামরিক সক্ষমতাকে জিয়া বাহিনী গেরিলা ও প্রথাগত যুদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করে মোকাবেলা করেছিল। জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত সুন্দরবনে টহলরত পাকিস্তানি সৈনিকদেরকে গেরিলা পদ্ধতি 'আঘাত করো ও সরে পড়ো নীতি' প্রয়োগ করে আক্রমণ করা হয়েছিল। (বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, ২০০৬:১৬০) তবে এই কৌশল স্থানীয় মানুষের জন্য ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ হওয়ায় বাহিনীর সামরিক নেতৃত্ব সমরকৌশলে পরিবর্তন আনেন। 'আঘাত করো ও সরে পড়ো নীতি' পরিত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধারা এবার সুন্দরবনে তাদের অবস্থানের পার্শ্ববর্তী পনেরো মাইল পর্যন্ত এলাকা মুক্ত রেখে সুন্দরবন এবং এর আশেপাশে শত্রুকে প্রলুদ্ধ করে এনে তাদের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১০৮) এই কৌশল অনুসরণ করার লক্ষ্য ছিল নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দাদেরকে যতটা সম্ভব প্রাণ ও সম্পদহানি থেকে রক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে জনসমর্থন ধরে রাখা ও বৃদ্ধি করা।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি এলাকা শত্রুবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষয়-ক্ষতি যথাসম্ভব কমানোর জন্য লে. জিয়া দুইটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি ঘাঁটি এলাকার খালগুলোর মাথায় শক্তিশালী প্রহরা চৌকি তৈরি করেন। শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে প্রধান নদী পথ থেকে খালে ঢোকার মুখেই এসব প্রহরা চৌকি তৈরি করা হয়েছিল। প্রধান নদী হয়ে ঢুকে শত্রুপক্ষ যাতে মুক্তিযোদ্ধাদের মূল ঘাঁটিগুলোতে খুঁজে না পায়। চৌকিগুলোর কোনো একটি আক্রমণের শিকার হলে কয়েকদিন পর্যন্ত যাতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায়, তেমন পরিমাণ যুদ্ধরসদ ও জনবল চৌকিগুলোর জন্য বরাদ্দ করা হতো। যাতে আক্রমণকারী এই চৌকিগুলোকেই মুক্তিযোদ্ধাদের মূল ঘাঁটি মনে করে। এ পদক্ষেপ ফলদায়ী হয়। শত্রুপক্ষ বারংবার এ চৌকিগুলোতে হামলা করে। তারা মূল ঘাঁটিতে কখনোই পৌঁছাতে পারেনি। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:১১০) মূল মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটির বিকল্প ঘাঁটি নির্মাণ ছিল লে. জিয়ার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। লে. জিয়া বিকল্প ঘাঁটি নির্মাণ করেন মূল ঘাঁটি হতে প্রায় পঁয়ত্রিশ কি.মি. দূরে বনের ভেতরে। শত্রুপক্ষ মূল ঘাঁটি আক্রমণ করলে মুক্তিবাহিনীর জন্য বিকল্প আশ্রয় নিশ্চিত করা ছিল এই পদক্ষেপের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া, শত্রুর বিমান হামলা, বিশেষ করে নাপাম বোমা হামলা থেকে মুক্তিবাহিনীর জনবল ও যুদ্ধরসদ রক্ষা করার চিন্তাও বিকল্প ঘাঁটি নির্মাণের পেছনে কাজ করেছিল। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১১৫)

জিয়া বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে আনুমানিক পঞ্চাশটির বেশি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১৪৮) এসব যুদ্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল

মোরেলগঞ্জের রাজাকার ঘাঁটি অভিযান, শরণখোলার রায়েন্দা রাজাকার ঘাঁটি অভিযান, তাফালবাড়ি রাজাকার ঘাঁটি অভিযান, মোরেলগঞ্জের রাজাকার ঘাঁটি অভিযান (২য় বার), দৈবজ্ঞহাটি রাজাকার ক্যাম্প অভিযান, ভান্ডারিয়া থানা অভিযান, কাউখালি থানা অভিযান, শরণখোলা অভিযান, ধানসাগর অভিযান, রায়েন্দা রাজাকার ঘাঁটি অভিযান (২য় বার) তুসখালী খাদ্যগুদাম অভিযান, ১২ দিনব্যাপী সুন্দরবনের যুদ্ধ, সরালিয়া ও রাজাপুর যুদ্ধ, ধানসাগর যুদ্ধ (২য় বার), আইরনের যুদ্ধ, বড় মাছুয়ার যুদ্ধ, মাপলাজোড় যুদ্ধ, তাফালবাড়ির যুদ্ধ, শরণখোলা থানা দখল, মঠবাড়িয়া থানা দখল, প্রভৃতি। এছাড়া, ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-মংলা নৌরুটে প্রায় প্রতিদিনই জিয়া বাহিনীর দ্বারা পাকিস্তানি সৈন্য ও রসদবাহী নৌযান ও গানবোট আক্রান্ত হতো। পাশাপাশি বগী, তাফালবাড়ি, সুপতি, মাছুয়া, তুসখালী, চরদুয়ানীতে (এগুলো সুন্দরবন সংলগ্ন স্থান) নিয়মিতভাবে পাকিস্তানি সৈন্য ও সহযোগীদেরকে এ্যামবুশ করা হতো। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১০৮, ১১৮) সুন্দরবনের ভেতরে অবস্থান করে ও স্থানিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সুবিধা ব্যবহার করে উল্লিখিত যুদ্ধগুলোতে মুক্তিযোদ্ধারা অংশ নেন। এসব অভিযান বা যুদ্ধগুলোর মধ্যে নমুনা স্বরূপ নির্বাচিত দুটি অভিযান/যুদ্ধের বর্ণনা নিচে উপস্থাপন করা হলো। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধারা কীরূপ সংকট মোকাবেলা করতেন এবং তা থেকে উত্তরণে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে এরা কী ধরনের পদক্ষেপ নিতেন— সে বিষয়ে একটা ধারণা এখানে পাওয়া যাবে।

### তুসখালি খাদ্য গুদাম অভিযান

জিয়া বাহিনীর সুন্দরবন ক্যাম্পে সেপ্টেম্বর মাস অবধি প্রায় নয় হাজার মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করছিলেন যাদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এছাড়া সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস এই এলাকার জন্য এমনিতেই খাদ্য সংকটের সময়। এসময় সাধারণ মানুষের নিকট থেকে খাদ্য সহায়তা পাওয়া যাবে না চিন্তা করে চলমান খাদ্য ঘাটতি ও আসন্ন খাদ্যাভাব দূর করতে ২৮ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা পিরোজপুরের তুসখালি খাদ্য গুদামে অভিযান পরিচালনা করা হয়। জিয়া বাহিনীর উপ-অধিনায়ক শামসুল আলম তালুকদারের নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন আলতাফ, আসাদ, হেলাল, সুবেদার গফফার, শহীদুল আলম বাদল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে প্রায় আড়াই হাজার সদস্য উল্লিখিত অভিযানে অংশ নেন। এ অভিযানে তাদের কাছে এলএমজি, এসএমজি, অটোমেটিক রাইফেল, এসএলআর, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড প্রভৃতি অস্ত্র ছিল।

তুসখালি পিরোজপুর মহকুমাধীন মঠবাড়িয়া থানা থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত যেখানে একটি সরকারি খাদ্য গুদাম ছিল। এই তুসখালির পাশ দিয়ে বলেশ্বর নদী প্রবাহিত। তুসখালির খাদ্য গুদাম দখল করতে জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে পরিকল্পনা স্থির করা হয় যে, শামসুল আলম তালুকদারের নেতৃত্বে খাদ্য গুদাম আক্রমণ করা হবে, ক্যাপ্টেন আলতাফ ও সুবেদার গফফারের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা মঠবাড়িয়া থানা ঘেরাও করবেন, শহীদুল আলমের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা খাদ্য গুদাম ও মঠবাড়িয়া থানার মধ্যবর্তী গুদিহাটা এলাকায় অবস্থান নেবেন যাতে মঠবাড়িয়া থেকে এসে কোনো রাজাকার/পুলিশ বাহিনী খাদ্য গুদাম আক্রমণকারী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে। এছাড়া চরখালি, চরদেয়ানী, তাফালবাড়ি, ঘমিয়াখালি প্রভৃতি স্থানের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুত রাখা হয়। যাতে এসব এলাকা থেকে রাজাকার দল বা বলেশ্বর নদীতে টহল দেওয়া পাকিস্তানি গানবোট মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কোনো অবস্থায় আক্রমণ করতে না পারে। এর বাইরে আরো কয়েকটি অ্যানুশ প্রস্তুত করা হয়। পরিকল্পনা মারফিক ত্রিশটি ছিপ নৌকায় করে মুক্তিযোদ্ধারা বগী থেকে যার যার গন্তব্যে রাত দশটায় রওনা দেন। ভোর তিনটায় শামসুল তালুকদারের দল (প্রায় চারশত মুক্তিযোদ্ধার দল) তুসখালির খাদ্য গুদাম পাহারারত রাজাকার ঘাঁটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এলএমজি ও অন্যান্য অস্ত্র সহকারে প্রথম ধাপে আক্রমণ চালায়। এতে রাজাকাররা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে।

এই ঘাঁটি থেকে প্রায় তিনশ রাইফেল উদ্ধার করা হয়। এরপর গুদাম দখল করে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ চাল নৌকায় তুলতে শুরু করেন। অন্যদিকে খাদ্য গুদাম আক্রান্ত হলে তুষখালি থেকে একদল রাজাকার মঠবাড়িয়া পালিয়ে যাবার পথে শহীদুল আলম বাদলের দলের এ্যাম্বুশের শিকার হয়। এ যুদ্ধে কয়েকজন রাজাকার আহত হন ও রাজাকারদের গুলিতে বিধান নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। এর বাইরে ক্যাপ্টেন আলতাফ ও সুবেদার গফফার মঠবাড়িয়া থানা চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখেন। এখানে দু'পক্ষই প্রায় দুই ঘণ্টা গুলি বিনিময় করে। এছাড়া আরো কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা দল শেলা নদী ও তুষখালির সামনের দিকের তেলিখালী ও চরখালীতে পাকিস্তানি গানবোট এ্যাম্বুশ করেন। তুষখালি খাদ্য গুদাম অভিযান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় দুই হাজার দুইশত মণ চাল সংগ্রহ করেন ও প্রায় তিনশত রাইফেল দখল করেন। এছাড়া মঠবাড়িয়া থানাও সফলভাবে ঘেরাও করে রাখা সম্ভব হয়। অন্যান্য সাফল্যের পাশাপাশি এ অভিযানে বিধান নামক একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১২৯-৩৩; শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:১৩৬-৪১ ও হুমায়ূন রহমান, ২০১৮:৯৫-৯৬)

### পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সুন্দরবন ঘাঁটি আক্রমণ প্রতিহতকরণ

২৮ সেপ্টেম্বর জিয়া বাহিনী পিরোজপুরের তুষখালি খাদ্য গুদাম আক্রমণ করে খাদ্য ও অস্ত্র দখল করে। তাই জিয়া বাহিনীর সুন্দরবন ঘাঁটি ধ্বংস করতে পাকিস্তানি সেনাদল ১ অক্টোবর ভোরবেলা সুন্দরবনে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানে হামলা চালায়। বাহিনী প্রধান জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রায় ছয় হাজার মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি, এমজি, রিকয়েললেস রাইফেল, স্টেনগান, অটোমেটিক রাইফেল, এসএমজি, ৩০৩ রাইফেল, আনার্গা গ্লেনেড ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের আক্রমণ প্রতিহত করেন।

মুক্তিবাহিনীর সুন্দরবনের বিভিন্ন ঘাঁটিতে পটুয়াখালীস্থ বেলুচ রেজিমেন্টের কমান্ডার মেজর নাদের পারভেজের নেতৃত্বে কয়েক হাজার সৈন্য ও রাজাকার হামলা চালায়। এর মধ্যে কয়েক কোম্পানি বেলুচ সৈন্য ও মিলিশিয়া, ছয়টি পাকিস্তানি গানবোট, একশ মোটর লঞ্চ, একাধিক বিমান ও সহস্রাধিক রাজাকার-দালাল অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুন্দরবনের বিভিন্ন ঘাঁটিতে একটানা বারদিন আক্রমণ চালানো হয়। ঘাঁটিগুলোর মধ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন বড় মাছুয়া, চরদোয়ানী, সুপতি, বগী, তাফালবাড়ি, জিউধরা প্রভৃতি বড় বড় ঘাঁটিই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তুষখালি খাদ্য গুদাম অভিযানের পর পাকিস্তানি পক্ষ থেকে যে একটি শক্ত প্রতিক্রিয়া আসবে তা জিয়াউদ্দিন ও অন্যান্য কমান্ডারগণ পূর্ব থেকেই অনুমান করেছিলেন। কিন্তু আক্রমণের তীব্রতা ও মেয়াদ যে এত দীর্ঘ ও ভয়ানক হবে, তা মুক্তিযোদ্ধারা কল্পনা করেননি। এ কারণে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের মিলিত আক্রমণের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধারা বিক্ষিপ্ত ও পরিকল্পনাহীন হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় জিয়াউদ্দিন তুরিৎ ঘুরে ঘুরে সবগুলো ঘাঁটিকেই পুনরুজ্জীবিত করেন ও তাদের শক্তিশালী করতে অস্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। সাথে সাথে তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা জানান। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানি পক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর মর্টার ও গানবোট থেকে প্রচুর শেল নিক্ষেপ করেন। এ রকম আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় মাছুয়া ঘাঁটির কমান্ডার সুবেদার গফফার মূল অবস্থান ছেঁড়ে গ্রামের কাছাকাছি একটি বাড়িতে অবস্থান নেন। তাদেরকে ধরতে শতাধিক পাকিস্তানি সৈন্য ঐ বাড়িতে আক্রমণ চালায়। তবে কাদাপানিতে অপরপক্ষ খানিকটা অসুবিধায় পড়ার সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় ত্রিশজন পাকিস্তানি সৈন্যকে ধরাশায়ী করেন। এদিকে শামসুল হক ব্যাপারী নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন। বড় মাছুয়ার যুদ্ধের একদিন পর বগীতে পাকিস্তানি সৈন্যদলের সাথে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়। বগী ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন হাবিলদার আলাউদ্দিন। বগী ক্যাম্পের কাছাকাছি বলেশ্বর নদীর পাড় ঘেঁষে মুক্তিযোদ্ধারা বাস্কার খনন করে সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। অন্যদিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা চার/পাঁচটি গানবোট নিয়ে বগী ফরেস্ট অফিসের ওপর আক্রমণ চালায় ও পার্শ্ববর্তী গাছতলা সুইজ গেটের কাছে

নেমে এগোতে থাকে। এ অবস্থায় হাবিলদার আলাউদ্দিন ও তার সহযোদ্ধারা পরিকল্পনা অনুযায়ী অপর পক্ষকে গুলির রেঞ্জে আসার সুযোগ দেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা এগোতে এগোতে কোনো বাধার সম্মুখীন না হওয়ায় কিছুটা টিলেচালাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির মুখে চলে আসেন। এমন সুযোগে আলাউদ্দিনসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে পাকিস্তানি সৈন্য ও গানবোটগুলোতে আক্রমণ চালান। এতে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয় ও অনেকে আহত হয়। উভয়পক্ষে এরপর প্রায় দু-ঘণ্টা গুলি বিনিময় করে। উল্লিখিত যুদ্ধগুলোর মতো মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার টিপু সুলতানের নেতৃত্বে তাফালবাড়িতেও পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ হয়। এখানেও কয়েকজন সৈন্য ও রাজাকার নিহত ও আহত হয়। এরূপ সুপতি, মঠবাড়িয়ার গোলবুনিয়া, বনৌ, ভোলা নদীর পাড়ের জঙ্গলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের সংঘর্ষ হয়।

পাকিস্তানি সৈন্যদলের আক্রমণ যখন নানাভাবে ব্যর্থ হচ্ছিল তখন তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিগুলোর ওপর বিমান ও গানবোট সহযোগে সাঁড়াশি হামলা চালানো শুরু করে। তবে বিমান হামলাতেও মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন ক্ষতি হয়নি। কারণ বিকল্প ঘাঁটি থাকায় মুক্তিযোদ্ধারা তুরিং অবস্থান পালটান। মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে বিমানগুলোকে আক্রমণ না করার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত করতে বিমানগুলো বিভ্রান্ত হয়; বিমান থেকে ফেলা গোলাগুলোর অধিকাংশ নরম কাঁদামাটি ও পানিতে পড়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে। তারপরেও পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কয়েকদিন পর্যন্ত আক্রমণ অব্যাহত রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যান। একটানা বার দিনব্যাপী আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল নগণ্য। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হক ব্যাপারী নিহত হন ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। অপরদিকে এ অভিযানে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার মিলিয়ে শতাধিক নিহত হয় ও বেশ কয়েকজন আহত হয়। (মো. লিয়াকত আলী খান, ২০০১:৫৫-৫৬; মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১৩৪-৪৮ ও শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:১৪৩-৫৭)

জিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ তাদের আওতাধীন এলাকায় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা বা বজায় রাখতেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাহিনী গঠনের প্রথম থেকে শেষাবধি স্থানীয় ডাকাত-লুটেরা-চোর-দুষ্কৃতকারীদেরকে মোকাবেলার চেষ্টা তারা অব্যাহত রাখেন। শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে (বিশেষ করে তাফালবাড়ি, বগী, আমড়াগাছিয়া, হইলাবুনিয়া, সোনখালী, ফুলহাতা, হ্যারমা, পাঁচগাঁও, ঢুলিগাথি, গজালিয়া প্রভৃতি) লুটপাট, ডাকাতি, নারী নির্যাতন বন্ধ করতে বহু দফায় অভিযান চালানো হয়। এসব অভিযানে তাফালবাড়ির লুটেরা বারেক খাঁ, বগীর দালাল ইউসুফ কারী, হইলাবুনিয়ার পঞ্চায়েত বাড়ির আব্দুল আজিজ নিহত হয় ও আব্দুল হাকিম গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে অত্র এলাকার প্রায় ২০ জন ডাকাত নিহত হয় ও তাদের নিকট থেকে কিছু অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। (হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ২০০৩:৬২৩ ও হুমায়ূন রহমান, ২০১৮:৯১) অনুরূপভাবে, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া, কাউখালি, ভান্ডারিয়া থানা এলাকার লুটেরা-ডাকাত-দালাল ও নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর ফলে ঐসব স্থানে অপরাধ একটি পর্যায় পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। জিয়া বাহিনীর প্রচেষ্টার ফলে সুন্দরবন লাগোয়া জনবসতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। শরণখোলা, বগী, তাফালবাড়ি, মোরেলগঞ্জের নিলুাঞ্চল, গোপখালী, চালতাবুনিয়া প্রভৃতি এলাকায় মুক্তাঞ্চল তৈরি করা ছিল এই মুক্তিবাহিনীর কৃতিত্ব। (শেখ গাউস মিয়া, ২০১১:১১৩)

#### বাংলাদেশের সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধে জল-জঙ্গলের যোদ্ধাদের প্রভাব

বাংলাদেশের সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনে সক্রিয় জিয়া বাহিনীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকাকে নানা দিক থেকে লক্ষ করা যায়। সুন্দরবনের যে অংশে জিয়া বাহিনীর বিচরণ ও এক প্রকার নিয়ন্ত্রণ ছিল, সে অংশে মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকারের



সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। বিশেষ করে ৯নম্বর সেক্টর কর্তৃপক্ষের জন্য তা আরো বেশি করে সত্য ছিল। কেননা, ৯ নম্বর সেক্টরভুক্ত অপরূদ্ধ এলাকার পশ্চিমে অবস্থিত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগনা জেলার সীমান্ত এলাকায় গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরণার্থী ক্যাম্প প্রভৃতির সাথে জলপথে ও স্থলপথে যোগাযোগ রক্ষা করার ক্ষেত্রে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার ও ৯নম্বর সেক্টর নেতৃত্বদের কাছে জিয়া বাহিনীর অপরিহার্যতা প্রশ্নাতীত হয়ে দেখা দেয়। সীমান্তে অবস্থান করেই সেক্টরভুক্ত এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ, সেক্টরভুক্ত এলাকায় ভারতে প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা ও সমরাস্ত্র প্রেরণ, অপরূদ্ধ এলাকা থেকে প্রশিক্ষণার্থী ও শরণার্থীদেরকে নিরাপদে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে সেক্টর কর্তৃপক্ষকে জিয়া বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছিল। সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ফরিদপুর জেলার মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটিতে প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা এবং সমরাস্ত্র পৌছানোর ক্ষেত্রে জিয়া বাহিনীর ঘাঁটিগুলোকে ট্রানজিট ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উপরন্তু, জিয়া বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকগণ ভারত প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে 'গাইড' হিসেবে কাজ করতেন। (হাসান হাফিজুর রহমান, ২০০৩:৬১৫-৩০) শুধু ৯নম্বর সেক্টরের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, ১০নম্বর সেক্টর কর্তৃপক্ষের জন্যও সুন্দরবনের এই মুক্তিযোদ্ধা দল প্রয়োজনীয় ছিল। মংলা বন্দর, চালনা বন্দর ও হিরণ পয়েন্টে পাকিস্তানি এবং বিদেশি জাহাজ ধ্বংস অভিযানে নিযুক্ত নৌ-কমান্ডোদেরকে সুন্দরবনে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান, গাইড প্রদানসহ আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করে জিয়া বাহিনী। (কমান্ডো মো. খলিলুর রহমান, ২০০৬:১০৪-৬৪ ও মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১০৯-১১) প্রকৃতপ্রস্তাবে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক অপরূদ্ধ বাগেরহাট-বরিশাল-পিরোজপুর-পটুয়াখালী এলাকা তথা বালেশ্বর নদীর উভয় তীরবর্তী এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের সামরিক নেতৃত্বের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক শক্তি ছিল সুন্দরবনের আলোচ্য মুক্তিযোদ্ধা দল। সীমান্তের এপার ও ওপারের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রধান সংযোগকারী শক্তি হিসেবে জিয়া বাহিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন ও পটুয়াখালী-বরিশাল-খুলনা জেলা মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য স্পর্শকাতর এলাকা ছিল বলা যায়। বিশেষ করে, মংলা ও চালনা নৌ বন্দরে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা ও ভারত থেকে উল্লিখিত এলাকা দিয়ে যাতে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ না ঘটে, সেটি নিশ্চিত করতে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় শক্তি নিয়োগ করবে- এটাই স্বাভাবিক ছিল। ভূ-কৌশলগতভাবে ও সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এরূপ এলাকায় জিয়া বাহিনীর উপস্থিতি বাংলাদেশ সেনা কর্তৃপক্ষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও ভারত প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অত্র এলাকায় যে মাত্রায় সংঘর্ষ হতে পারত, তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল সুন্দরবনের জল ও জঙ্গলে স্বপ্রণোদিতভাবে গড়ে ওঠা জিয়া বাহিনীর সামরিক সাফল্যের কারণে। বাংলাদেশ সেনা নেতৃত্বদের নতুন মুক্তিযোদ্ধা তৈরির প্রকল্প আরো বেগবান করেছিল জিয়া বাহিনী। সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার ফলে খুলনা-বরিশাল-পটুয়াখালী জেলার মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে আগ্রহী ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবী প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পেরেছিলেন। জিয়া বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষিত হয়ে উল্লিখিত এলাকার প্রায় আট হাজার মুক্তিযোদ্ধা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছিলেন। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), ১৯৯৩:১১২) সুন্দরবন ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের ভেতরেই যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নতুন মুক্তিযোদ্ধা তৈরি হচ্ছে, তা ৯নম্বর সেক্টর অধিনায়ক ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। (মেজর এম এ জলিল, ১৯৭৪:১৬৬) সম্ভবত সে কারণেই, জিয়া বাহিনীর জন্য সমরাস্ত্র সরবরাহ করতে সেক্টর নেতৃত্বদ্বন্দ্ব কাৰ্পণ্য করেনি। শরণার্থী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই বাহিনীর নেতৃত্বদের উজ্জ্বল ভূমিকা এই সাথে স্মরণযোগ্য। নেতৃত্বদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে উল্লিখিত এলাকার লক্ষাধিক শরণার্থী এই বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর এই তৎপরতা নিশ্চয়

শরণার্থী, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ও দেশি-বিদেশি মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে জিয়া বাহিনী এবং সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে থাকবে।

### উপসংহার

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নয়, নয় তার স্বাভাবিক দিক। জল ও জঙ্গলময় এরূপ প্রতিকূল পরিবেশে ও আবহাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অনেকক্ষেত্রে বাধ্য হতে হয়েছিল প্রকৃতির নির্দেশ মেনে নিতে। যেমন, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গহীন বনের অভ্যন্তরে থাকার বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ মেনে নিতে হয়েছিল। যোগাযোগের প্রয়োজনে নির্ভর করতে হয়েছিল বিকল্পহীন জঙ্গল অভ্যন্তরস্থ কর্দমাক্ত কাঁচা পথ ও দুর্লভজন্য নৌপথ। এই পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেখা যায় প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য একদিকে যেমন অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে সচেষ্ট, তেমন প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করে দখলদার বাহিনীকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার আয়োজনে ক্রিয়াশীল। এজন্য, গোটা সময়েই মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক-বেসামরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান অবলম্বন হয়েছিল নৌকা, বিশেষ করে ছোটো নৌকা। এই ক্ষেত্রে বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌকা যোগাড় করতে বাহিনীর উদ্যোক্তাদেরকে নির্ভর করতে হয়েছিল স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও গ্রামবাসীদের ওপর। আবার এও দেখা যায় যে, বিরূপ প্রকৃতিকে বশ মানিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বন অভ্যন্তরে যুদ্ধরসদের অন্যতম খাদ্যের চাহিদা মেটাতে তারা মরণপণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পাকিস্তানি গানবোট প্রবেশ করতে অক্ষম এমন দুর্গম স্থানে মূল ঘাঁটি নির্মাণ, অপরপক্ষকে নাস্তানাবুদ করতে প্রকৃতির বাধা ডিঙিয়ে (বন পরিষ্কার করে মাচাং ঘর তৈরি করা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, খাল কাটা, কাঁচা রাস্তা তৈরি করা, প্রভৃতি) বা প্রকৃতিকে ব্যবহার করে (গভীর জঙ্গল ও কর্দমাক্ত স্থানে অবস্থান করা, অপরপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে বড় গাছের ডালে ডালে সশস্ত্র অবস্থান করে শত্রুপক্ষের নৌযানগুলোতে আঘাত করা, ইত্যাদি) এমন রণকৌশল তারা অনুসরণ করেছিলেন, যা বাংলাদেশের অপরাপর স্থানের মুক্তিযুদ্ধের রণনীতিতে বিরল। এর অন্যতম ছিল গেরিলা যুদ্ধনীতির বহুল অনুসৃত 'হিট এন্ড রান' নীতি পরিত্যাগ করা। সে স্থলে এ বাহিনীর প্রধান রণনীতি ছিল দু-ধরনের— (১) মুক্তিযোদ্ধাদের জনবসতিহীন অধিকৃত এলাকায় উচ্চনিম্নক তৎপরতা চালিয়ে শত্রুকে ডেকে এনে চরম আঘাত করা; (২) ঢাকা-মংলা-খুলনা নৌপথে শত্রুশিবিরের সামরিক ও বেসামরিক যানে গেরিলা হামলা পরিচালনা করা। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ প্রলম্বিত হলে সুন্দরবনে দীর্ঘমেয়াদে অবস্থান করেই যাতে শত্রুপক্ষকে মোকাবেলা করা যায়, সেইমতো প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন জিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ। অপরদিকে, গানবোট, মোটর লঞ্চ, স্টিমার, বড় নৌকা ছাড়া পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী শক্তিকে আলোচ্য এলাকায় চলাচল করতে দেখা যায়নি। বিশেষত, বনের অভ্যন্তরে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধা দলকে মোকাবেলা করার জন্য কখনোই পাকিস্তানি সৈন্যদল জল-কাঁদামাটি ডিঙিয়ে মুক্তিযোদ্ধা অবস্থানে হানা দেয়নি। তারা গানবোটে থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মোকাবেলা করেছে। (হেমায়েত উদ্দিন বাদশা, ২০১৯) অর্থাৎ, পাকিস্তানি সৈন্যদল আলোচ্য স্থানে প্রাকৃতিক বাধা মোকাবেলার ক্ষেত্রে তেমন সচেষ্ট ছিল না। স্থানিক বৈশিষ্ট্যের সাথে অভিযোজন করে মোঘল শক্তি যেভাবে বাংলা জয় করেছিল, (Pratyay Nath, 2019:57-67) পাকিস্তানি সেনাদল সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধে সেরূপ সক্ষমতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। আর এ অভিযোজন সক্ষমতার কারণেই, অসম শক্তি হওয়া সত্ত্বেও জিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা দল সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন স্থানসমূহে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের স্থানীয় সহযোগী শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাবি করা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য দেশের অপরাপর সমতল ভূমিতে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ও স্বকীয় ছিল। প্রতিকূল পরিবেশকে এখানকার মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসতে যে উদ্ভাবনী দক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অনুকরণীয়। এই জল ও জঙ্গলময় সুন্দরবনের

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রণনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বিশেষ অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

## টীকা

১. সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধ : মুক্তিযুদ্ধকালে সুন্দরবন ও নিকটবর্তী এলাকায় ব্যক্তি প্রচেষ্টায় একটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ ত্যাগকারী সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে। মুক্তিযুদ্ধকালে লে. জিয়াউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা তৎকালীন বাগেরহাট মহকুমাভুক্ত শরণখোলা থানার দক্ষিণাঞ্চল এবং বলেশ্বর ও শেলা নদীর মধ্যবর্তী সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে একটি ঘাঁটি গড়ে তোলেন। এই মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটিটি কালক্রমে সুন্দরবন ঘাঁটি নামে পরিচিত লাভ করে। ১৯৭১-র ১২ জুলাইয়ে সুন্দরবন ঘাঁটি ৯নম্বর সেক্টরভুক্ত একটি সাবসেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। (এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, ২০১২:৬১) স্মর্তব্য, সুন্দরবন সাবসেক্টরটি সুন্দরবন ও পিরোজপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়। এই এলাকার মুক্তিযুদ্ধ একইসাথে সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে এই লেখায় ব্যবহৃত হয়েছে।
২. অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি চিন্তাবিদ টুরগো (Turgot) বা মন্টেস্কুর (Montesquieu) মতে, মানুষের জীবন, নীতিবোধ, আইন, প্রথা এমনকি রাজনৈতিক সংগঠনসমূহও প্রত্যক্ষভাবে তার ভৌগোলিক পরিবেশ বা প্রকৃতি নির্দেশিত। (A. N. Chumakov, 2016) ভৌগোলিক নির্ধারণবাদী বা নিয়তিবাদী এই ধারণাকে আরো অগ্রসর করেন উনিশ শতকের নেতৃত্বান্বিত জার্মান ভূগোলবিদ ও জাতিতত্ত্ববিদ ফ্রেডেরিশ র্যাডেল। তাঁর বিখ্যাত *Political Geography* (1887) এর মূল ভাষ্য হচ্ছে, মানব সমাজ সমগ্র বিশ্বের একটি অংশ এবং সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্যের উপর এর ভূদৃশ্য ('Landscape') ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মূলগত বা নির্ধারণী প্রভাব হয়েছে। (A. N. Chumakov, 2016) এরূপ ভাবনাকে আরো স্পষ্ট করে কিথ বুকানন বলেছেন, "The old environmentalist approach as the belief that the natural environment firmly molded man and his activities, a belief that in its extreme form postulated an inevitable, almost fatalistic, relationship between man and environment." (K. Buchanan, 1954:8)
৩. ১৯৭১ সালে সুন্দরবনে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা কাটা খাল। শরণখোলা রেঞ্জ থেকে সুন্দরবন সাবসেক্টরের হেডকোয়ার্টার তাম্বুলবুনিয়ার সরাসরি দূরত্ব ছিল প্রায় পাঁচ-ছয় কিলোমিটার। কিন্তু ভোলা ও দুধমুখী নদী ঘুরে জলপথে সেখানে যেতে দূরত্ব হতো প্রায় দশ কিলোমিটার। অন্যদিকে গোলবুনিয়া খালের আগা থেকে তাম্বুলবুনিয়া খালের আগা ছিল প্রায় এক কিলোমিটার। এই অবস্থায় দূরত্ব কমানোর প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধারা উল্লিখিত দুটো খালের সাথে একটি সংযোজক খাল কাটেন এবং এর নাম রাখেন জয়বাংলার ভারানী। (মেজর জিয়াউদ্দিন (অব:), ১৯৯৩:১১২)
৪. ফেভারের বিখ্যাত উক্তি 'There are no necessities but everywhere possibilities; and Man as master of these possibilities is the judge of their use. (Lucien Febvre, 1932:12)
৫. টেইলর মত প্রকাশ করেন যে, "man is able to accelerate, slow or stop the progress of a country's (region's) development ... but he should not, if he is wise, depart from directions as indicated by the natural environment. Man is like the traffic controller in a large city who alters the rate but not the direction of progress. The human agency, through the use of technology, can modify the force of nature but cannot escape it. Thus, the role of human agency is similar to that of a traffic regulator." (Griffith Taylor (ed.), 1952:25)

৬. এই তত্ত্বটি আদতে টেইলরের ভাবনা থেকে দূরবর্তী কিছু নয়। এখানে স্পেট মত প্রকাশ করেছেন যে, “Although the physical environment does not uniquely determine human actions, it does nonetheless make some responses more likely than others” অর্থ্যাৎ, প্রকৃতিতে মানুষের কর্মকাণ্ড একান্তভাবে প্রকৃতি নির্ধারিত নয়। প্রকৃতি বরং মানুষকে কতক সুযোগ প্রদান করে। মানুষ সে সুযোগসমূহের মধ্যে সর্বোত্তমটিকে অনুসরণ করে বা ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। (O.H.K Spate, 1957:3-12)
৭. লে. জিয়াউদ্দিনের প্রকৃত নাম আলী হায়দার জিয়াউদ্দিন আহমেদ। বর্তমান প্রবন্ধে লে. জিয়াউদ্দিন ছাড়াও তাকে জিয়াউদ্দিন আহমেদ, লে. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, লে. জিয়া, জিয়া নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।
৮. প্রবন্ধের বর্তমান অংশটির সাথে লেখকের এম.ফিল অভিসন্দর্ভের কিছু অংশের (পৃ. ২৮৭, ২৯০-৯৪) ধারণাগত ও তথ্যগত সাযুজ্য রয়েছে।

### উল্লেখপঞ্জি

- এ. এফ. এম আবদুল জলীল (১৯৬৮)। সুন্দরবনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। লিঙ্কম্যান পাবলিকেশন্স, ঢাকা
- এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন (২০১২)। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান। সময় প্রকাশ, ঢাকা
- কমান্ডো মো. খলিলুর রহমান (২০০৬)। মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা
- ড. মোঃ আবু হানিফ শেখ (২০১৬)। বাংলাদেশের নদ-নদী ও নদী তীরবর্তী জনপদ। অবসর, ঢাকা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর-নয় (২০০৬)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
- মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন ও আসাদুজ্জামান (২০০১)। সুন্দরবন সমরে ও সুষমায়। তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা
- মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.) (১৯৯৩): মুক্তিযুদ্ধের সেই উন্মাতাল দিনগুলি। মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশনীর পক্ষে বেগম কানিজ মাহমুদা, ঢাকা
- মেজর এম এ জলিল (১৯৭৪)। সীমাহীন সমর। জনতা প্রকাশন, ঢাকা
- মো. লিয়াকত আলী খান (২০০১)। মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবন সাব-সেক্টর। প্রকাশক: লেখক, বাগেরহাট
- লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী (১৯৯১)। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেবা পাবলিশার্স, ঢাকা
- শেখ গাউস মিয়া (২০১১)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : সুন্দরবন সাব-সেক্টর। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা
- স্বরোচিস সরকার (২০০৬)। একাত্তরে বাগেরহাট। সাহিত্য বিলাশ, ঢাকা
- হুমায়ূন রহমান (২০১৮)। পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। আপন প্রকাশ, ঢাকা
- হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.) (২০০৩)। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র, দশম খণ্ড। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা
- এ কে এম নাসিমুজ্জামান (সম্পা.) (২০২৩)। মানচিত্রে পৃথিবী ও বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ। গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন্স, ঢাকা
- সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর জব্বার (২০২৩)। প্রবন্ধকার কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বিকাল ৩টা
- সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিন বাদশা (২০১৯)। প্রবন্ধকার কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন, শরণখোলা, বাগেরহাট, ২৬ মার্চ ২০১৯, দুপুর ১২টা

- Alan R. H. Baker (2003). *Geography and History Bridging the Divide*. Cambridge University Press
- A. N. Chumakov (2016). 'Geographical Determinism', <https://www.researchgate.net>, DOI: 10.13140/RG.2.1.4481.5447, retrieved at 10pm, 22.06.2023
- A. Rashid (1961). *District Census Report Khulna, Parts, I-V, 1961*. Government of East Pakistan
- Griffith Taylor (ed.) (1952). *Geography in the Twentieth Century*. Methuen, London
- K. Buchanan (1954). *Geography and Human Affairs*. Victoria University College, Wellington, New Zealand
- LT G. JFR Jacob (2004). *Surrender at Dacca : Birth of a Nation*. UPL, Dhaka
- Lucien Febvre (1932). *A Geographical Introduction to History*. Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. Ltd. London
- Major James Rennell [Kalyan Rudra ed.] (2016). *A Bengal Atlas, Vol. 1*. Sahitya Samsad, Kolkata
- Motaharul Haque (1957). *Final Report on the Divisional Survey and Settlement Operations in the District of Bakerganj 1940-42 & 1945-50 and Khulna Sundarbans 1947-50*. Government of East Pakistan, Directorate of Land Records and Surveys
- O.H.K Spate (1957). 'How determined is Possibilism?', *Geographical Studies, Vol. 4*, No-1. London
- O'Malley, L.S.S (1908). *Bengal District Gazetteers: Khulna*. The Bengal Secretariat Book Depot., Calcutta
- Pratyay Nath (2019). *Climate of Conquest War, Environment, and Empire in Mughal North India*. Oxford University Press, New Delhi